আর-রাহীকুল মাখতূম

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নাবী (সাঃ)-এর পরিবার (الْبَيْتُ النَّبَوِيْ)

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আল্লামা সফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহঃ)

১১. মায়মুনাহ বিনতে হারিস (রাঃ) (مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ)

তিনি ছিলেন উম্মুল ফযল লুবাবাহ বিনতে হারিসের বোন। রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর ৭ম হিজরীতে যুল ক্বা’দাহ মাসের ক্বাযা উমরাহ্ শেষ করার পর বিশুদ্ধ কথায় ইহরাম হতে হালাল হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। মক্কা হতে ৯ মাইল দুরত্বে সারিফ নামক স্থানে বাসর যাপন করেন। ৬১ হিজরীতে সারিফে ইনতিকাল করেন। আবার বলা হয় যে, তিনি ৩৮ বা ৬৩ হিজরীতে ইনতিকাল করেন এবং তাঁকে সেখানেই সমাহিত করা হয়। তার সমাহিত স্থান প্রসিদ্ধ লাভ করেন।

উপর্যুক্ত এগার জন মহিলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সাহচর্য ও বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। এদের মধ্যে খাদীজাহ এবং উম্মুল মাসাকীন যায়নাব (রাঃ) নাবী কারীম (ﷺ)-এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ওফাত প্রাপ্তির পর ৯ জন উম্মাহাতুল মু’মিনীন জীবিত ছিলেন। এছাড়া, আরও দু’জন মহিলা সম্পর্কে জানা যায় যাঁদেরকে নাবী কারীম (ﷺ)-এর খিদমতে বিদায় করা হয় নি। এ দু’ জনের মধ্যে একজন ছিলেন বনু কিলাব গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অন্য জন ছিলেন কিন্দাহ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। কিন্দাহ গোত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত এ মহিলাই জোনিয়া নামে প্রসিদ্ধ। এ মহিলার সঙ্গে নাবী কারীম (ﷺ) বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিলেন কিনা এবং তাঁর পরিচয়ের ব্যাপারে চরিতকারদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। আমরা এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার কোন প্রয়োজন বোধ করছি না।

মোটামুটিভাবে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাঁর সংসারে দু’ জন দাসী রেখেছিলেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছে মারিয়া ক্বিবত্বীয়া যাকে মিশরের শাসক মুক্বাওয়াক্বিস উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করেছিলেন। এর গর্ভে নাবী কারীম (ﷺ)-এর পুত্র ইবরাহীম জন্ম গ্রহণ করেন। নাবী কারীম (ﷺ)-এর পুত্র ২৮ কিংবা ২৯শে শাওয়াল ১০ম হিজরী মুতাবিক ২৭শে জানুয়ারী ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে মদীনায় মৃত্যুবরণ করেন।

দ্বিতীয় দাসী ছিলেন রায়হানাহ বিনতে যায়দ যিনি ইহুদী গোত্র বনু নাযীর কিংবা বনু কুরাইযাহর সঙ্গে সম্পর্কিত। তিনি ছিলেন বনু কুরাইযাহ যুদ্ধবন্দীদের দলভুক্ত। তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর তত্ত্বাবধানেই থাকেন। তাঁকে নিজের জন্য মনোনীত করে নেন। তাঁর সম্পর্কে কতক চরিতকারদের ধারণা ছিল এরূপ যে, নাবী কারীম (ﷺ) তাঁকে মুক্তি করে দিয়ে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন।

কিন্তু ইবনুল কাইয়্যেমের মতে প্রথম কথাই অগ্রগণ্য। আবূ উবাইদাহ্ ঐ দু’ দাসী ছাড়া অতিরিক্ত আরও দু’জন দাসীর কথা উল্লেখ করেছেন। এ দুই জনের মধ্যে একজনের নাম জামীলা যিনি কোন যুদ্ধবন্দীদের দলভুক্ত ছিলেন। দ্বিতীয় জনকে যায়নাব বিনতে জাহশ রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর জন্য হিবা করেছিলেন।[1]

এ পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর পবিত্র জীবনের প্রাসঙ্গিক একটি দিক সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা ও আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। নাবী কারীম (ﷺ) তাঁর যৌবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে প্রায় ত্রিশ বছর যাবত একমাত্র স্ত্রীর

সাহচর্যে জীবন অতিবাহিত করেছিলেন। তাঁর সে স্ত্রী অর্থাৎ খাদীজাহ (রাঃ) ছিলেন প্রায় বিগত যৌবনা। এরপর তিনি বিবাহ করেন সওদা (রাঃ)-কে তিনিও ছিলেন বর্ষিয়সী মহিলা। তবে কি এ ধারণা করা সঙ্গত কিংবা গ্রহণযোগ্য হবে যে, বার্ধক্যের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়ে যৌন প্রয়োজনেই তাঁকে পরবর্তী সময়ে ৯টি স্ত্রী গ্রহণ করতে হয়? তা কখনোই হতে পারে না। নাবী কারীম (ﷺ)_এর পবিত্র জীবনের উভয় স্তর সম্পর্কে নিরপেক্ষতার সঙ্গে সমীক্ষা করে দেখলে কোন বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিই এ মতকে যুক্তিযুক্ত মনে করতে পারবে না। বরং তাঁকে অবশ্যই এটা স্বীকার করতে হবে যে, নাবী কারীম (ﷺ)_এর অধিক সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের পিছনে ছিল তাঁর নবুওয়াতী কার্যক্রমের মহান উদ্দেশ্য যা ছিল বিবাহর থেকে অনেক মহান।

এর ব্যাখ্যাস্বরূপ এখানে উল্লেখ করা যায় যে, আয়িশাহ এবং হাফসাহ (রাঃ)-এর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে আবূ বাকর ও উমার (রাঃ)-এর সঙ্গে নাবী কারীম (ﷺ) বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন। এ ভাবেই উসমান (রাঃ)-কে দু' কন্যা (রুক্বাইয়া (রাঃ) এবং উম্মু কুলসুম (রাঃ)) এবং আলী (রাঃ)-এর সঙ্গে কলিজার টুকরো ফাত্বিমাহ (রাঃ)-এর বিবাহ দিয়ে যে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছিলেন তার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে এ চার জন সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলা। কারণ, এ চার ব্যক্তিই ইসলামের চরম দুর্যোগপূর্ণ বিভিন্ন সময়ে কুরবানী ও আত্মত্যাগের অসামান্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলেন।

তৎকালীন আরবের প্রচলিত রীতি ছিল বৈবাহিক সম্পর্কের উপর চরম গুরুত্ব ও সম্মান প্রদান। তাদের নিকট জামাতা সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত সম্মানের ব্যাপার এবং জামাতার সঙ্গে যুদ্ধ করা কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারটি ছিল চরম লজ্জার ব্যাপার। প্রচলিত এ পদ্ধতিকে এক মহান উদ্দেশ্য সাধনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে নাবী কারীম (ﷺ) একাধিক বিবাহ করেন ইসলামের বিরুদ্ধবাদী শক্তিকে সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে। তাঁর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কৌশলটি ইসলামের ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচনা করে।

অন্যান্য ক্ষেত্রেও তিনি একই নীতি অনুসরণ করেন। উম্মু সালামাহ (রাঃ) ছিলেন বনু মাখযুমের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং তা ছিল আবূ জাহল এবং খালিদ বিন ওয়ালিদের গোত্র। উহুদ যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ (রাঃ)-এর যে ভূমিকা ছিল উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর সঙ্গে নাবী কারীম (ﷺ)_এর বিবাহের পর সে ভূমিকা পরিবর্তিত হয়ে যায়। অল্প দিন পরেই তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। অনুরূপভাবে আবূ সুফইয়ানের কন্যা উম্মু হাবীবাহ (রাঃ)-কে যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিবাহ করলেন আবূ সুফইয়ান আর তখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী থাকলেন না। অধিকন্তু, জুওয়াইরিয়া এবং সাফিয়্যাহ (রাঃ)-কে যখন পত্মীত্বে বরণ করে নিলেন তখন বনু মুসত্বালাক্ব গোত্র এবং বনু নাযীর গোত্রের যুদ্ধংদেহী ভাব আর রইল না। এ বিবাহ বন্ধনের পর এ গোত্রদ্বয়ের সঙ্গে কোন যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা অসদ্ভাবের তথ্য ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বরং এ বিবাহের পর জুওয়াইরিয়া স্বীয় সম্প্রদায়ের জন্য একজন অত্যন্ত মর্যাদা সম্পন্ন এবং বরকতময় মহিলা হিসেবে অভিহিত হন। কারণ, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তখন সাহাবীগণ (রাযি.) তাঁর গোত্রভুক্ত একশত পরিবারের বন্দীকে মুক্ত করে দিলেন এবং বললেন, 'এরা যেহেতু নাবী কারীম (ﷺ)_এর শ্বশুর বংশের লোক সেহেতু এদের মুক্তি দেয়া হল।'- এ মুক্তি এবং এ বাণী তাদের অন্তরকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

ওই সকল ব্যাপারের চাইতেও যে বিষয়টি ছিল সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এক অপরিণামদর্শী সম্প্রদায়ের লোকজনদের শিক্ষাদীক্ষা, তাদের প্রবৃত্তিকে পবিত্র ও সুসংহত করা এবং সভ্যতা ও সামাজিক শিক্ষা দেয়ার জন্য নির্দেশিত ছিলেন যারা ছিল শালীনতা, সামাজিকতা ও নৈতিকতার সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে

অপরিচিত। অথচ ইসলামী সমাজ সংগঠনের ক্ষেত্রে পুরুষ ও মহিলাদের অবাধ সংমিশ্রণের কোন অবকাশ ছিল না এবং এ ব্যাপারে অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল মহিলাদের উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজন কোন অংশেই কম ছিল না, বরং যেহেতু তাদের শিক্ষাদীক্ষার সুযোগ ছিল অত্যন্ত সীমিত সেহেতু তার প্রয়োজন ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী।

এ কারণেই নাবী কারীম (ﷺ)–এর সামনে একটি পথ খোলা ছিল এবং সেটি ছিল বিভিন্ন বয়স এবং অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এমন কতগুলো মহিলা মনোনীত করা যাদের মাধ্যমে মহিলাদের শিক্ষাদীক্ষার জন্য তিনি উপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। তাঁদের নির্বাচনের পর তিনি তাঁদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করবেন, তাঁদের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তিকে পবিত্র করে নেবেন। তাঁদেরকে শরীয়তের হুকুম আহকাম শিক্ষা দিবেন এবং ইসলামী সভ্যতা এবং সাজ-সজ্জায় এমনভাবে সজ্জিত করে তুলবেন যাতে তাঁরা শহর এবং গ্রামের সর্বত্র গমন করে যুবতী, বয়স্কা বৃদ্ধা সকল বয়সের মহিলাদের ইসলামের হুকুম আহকাম ও মসলা মাসায়েল শেখাতে পারেন। নাবী কারীম (ﷺ)–এর প্রচার কাজে তাঁরা সুযোগ মত সহযোগী হয়ে কাজ করতে পারেন।

এ প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই যে, মুসলিম সমাজের মহিলাদের নিকট ইসলামের শিক্ষাদীক্ষা ও নাবী (ﷺ)–এর সুন্নাত পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের (রাঃ) ভূমিকা ছিল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মধ্যে থেকে যাঁরা দীর্ঘায়ু লাভ করেছিলেন এ ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ, যথা আয়িশা (রাঃ) নাবী (ﷺ)–এর কথা ও কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

নাবী কারীম (ﷺ)–এর এক বিবাহ জাহেলিয়াত যুগের এমন এক প্রথার ভিত্তি মূল উৎপাটিত করেছিল যা বহু পূর্ব থেকে চলে আসছিল এবং একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্কারে পরিণত হয়েছিল। প্রথাটি ছিল পোষ্য পুত্র সম্পর্কিত। জাহেলিয়াত যুগে পোষ্য পুত্রকে ঔরষজাত সন্তানের দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করা হতো এবং ঔরসজাত সন্তানের ন্যায় সে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ও সম্মান লাভ করত। এ প্রথার শিকড় আরব সমাজ ব্যবস্থার অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত ছিল যার মূল উৎপাটন করা ছিল অত্যন্ত দূরূহ কিন্তু ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্তরাধিকার, বিবাহ, তালাক ইত্যাদি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধনের ফলে জাহেলিয়াত যুগের সেই সকল সামাজিক ভিত্তিমূল ক্রমান্বয়ে শিথিল হয়ে শেষ পর্যন্ত উৎপাটিত হয়ে পড়ে।

অধিকন্তু, জাহেলিয়াত যুগের বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ক্ষতিকারক এবং অশ্লীল। কাজেই, ইসালামের প্রথম কর্তব্য ছিল সমাজ থেকে সে সকল ক্ষতিকর বিধি ব্যবস্থা এবং অশ্লীলতা নির্মূল করা। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–কে যায়নাব বিনতে জাহশের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন। যায়নাব ছিলেন যায়েদের স্ত্রী এবং যায়দ ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর পোষ্য পুত্র। কিন্তু যায়দ ও যয়নবের মধ্যে মিল মহববত সৃষ্টি না হওয়ার কারণে যায়দ তাঁকে তালাক দেয়ার মনস্থ করলেন। এটা ছিল সে সময় যখন কাফিরগণ নাবী কারীম (ﷺ)–এর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে সম্মুখভাগে আসার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। উপরন্তু, খন্দকের যুদ্ধের জন্যও তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করছিল।

এদিকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে পোষ্য পুত্র সম্পর্ক রহিত করার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)–এর মনে এ আশঙ্কার সৃষ্টি হল যে এমনি এক অবস্থার প্রেক্ষাপটে যায়দ যদি তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেন এবং যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে যদি নাবী (ﷺ)–কে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে হয় তাহলে মুনাফিক্ব, মুশরিক ও ইহুদীরা এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে খুব জোরে সোরে অপপ্রচার শুরু করবে যা সরল প্রাণ

মু'মিনদের মনে কিছুটা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এটা চাচ্ছিলেন যে যায়দ যেন যায়নাবকে তালাক না দেন এবং সে রকম কোন পরিস্থিতিও যেন সৃষ্টি না হয়।

কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নাবী কারীম (ﷺ)-এর এ মনোভাব পছন্দ করলেন না। ইরশাদ হল,

(وَإِذْ تَقُوْلُ لِلَّذِيْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ) [الأحزاب: 37]

'স্মরণ কর, আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন আর তুমিও যাকে অনুগ্রহ করেছ তাকে তুমি যখন বলছিলে- তুমি তোমার স্ত্রীকে (বিবাহবন্ধনে) রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার অন্তরে লুকিয়ে রাখছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চান, তুমি লোকভয় করছিলে, অথচ আল্লাহ্ই সবচেয়ে বেশি এ অধিকার রাখেন যে, তুমি তাঁকে ভয় করবে।' [আহযাব (৩৩) : ৩৭]

যায়দ শেষ পর্যন্ত যায়নাবকে তালাক দিয়ে ফেললেন। অতঃপর যখন তাঁর ইদ্দত কাল অতিক্রান্ত হল তখন তাঁর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বিবাহের ব্যাপারটি স্থিরীকৃত হয়ে গেল। এটা এড়ানোর আর কোন পথই রাখা হল না। আল্লাহ তা'আলা নাবী কারীম (ﷺ)-এর জন্য এ বিবাহ আবশ্যকীয় করে দিলেন। ইরশাদ হল

(فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِيْ أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا) [الأحزاب: 37]

'অতঃপর যায়দ যখন যায়নাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করল তখন আমি তাকে তোমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করে দিলাম যাতে মু'মিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব নারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মু'মিনদের কোন বিঘ্ন না হয়।' [আহযাব (৩৩) : ৩৭]

এর উদ্দেশ্য ছিল, পোষ্য ছেলেদের সম্পর্কে জাহেলিয়াত যুগে যে সংস্কার ও সাধারণ ধারণা প্রচলিত ছিল তা সম্পূর্ণরূপে মুলোৎপাটিত করা যে ভাবে এ আয়াত দ্বারা তা রহিত করা হয়ে গেল।

(ادْعُوْهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللهِ) [الأحزاب: 5]

[তাদেরকে তাদের পিতৃ-পরিচয়ে ডাক, আল্লাহর কাছে এটাই অধিক ইনসাফপূর্ণ।' [আল-আহযাব (৩৩) :৫'

(مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُوْلَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّيْنَ) [الأحزاب: 40]

মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যেকার কোন পুরুষের পিতা নয়, কিন্তু (সে) আল্লাহর রসূল এবং শেষ নাবী। [আল-আহযাব (৩৩) :৪০]

এখানে এ কথাটি স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে সমাজে যখন কোন প্রথার ভিত্তিমূল দৃঢ় হয়ে যায় তখন শুধুমাত্র কথার দ্বারা তার মূলোৎপাটন কিংবা সংস্কার সাধন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। বস্তুত যে ব্যক্তি তার মুলোৎপাটন কিংবা পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হন তাঁর বাস্তব কর্মপদ্ধতির নমুনা বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। হুদায়বিয়াহ সন্ধি চুক্তির সময় মুসলিমগণের পক্ষ হতে যে আচরণ ধারা এবং ভাবভঙ্গী প্রকাশিত হয় তা থেকে এ প্রকৃত সত্যটি মুশরিকদের দৃষ্টিপটে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে সময় মুসলিমগণের মধ্যে ইসলামের প্রতি উৎসর্গীকরণ এবং নাবী প্রীতির যে পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হয় তাতে মুশরিকগণ অভিভূত হয়ে পড়ে। উরওয়া বিন মাসউদ সাকাফী যখন প্রত্যক্ষ করল যে, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর মুখের থু থু এবং লালা সাহাবীগণ গভীর আগ্রহ ভরে হাত পেতে গ্রহণ

করছেন এবং নাবী কারীম (ﷺ)-এর অযুর নিক্ষিপ্ত পানি গ্রহণের জন্য সাহাবীগণের মধ্যে রীতিমত প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যাচ্ছে তখন তার মনে দারুন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে যায়।

জী হ্যাঁ, এরা ছিলেন সে সকল সাহাবা (রাযি.) যাঁরা বৃক্ষের নীচে মৃত্যু অথবা পলায়ন না করার শপথ গ্রহণের জন্য একজন অপর জনের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এরা ছিলেন সেই সাহাবীগণ (রাযি.) যাদের মধ্যে আবূ বাকর এবং উমার (রাঃ)-এর মতো জীবন উৎসর্গকারীগণও বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু নাবী কারীম (ﷺ)-এর জন্য অর্থাৎ ইসলামের স্বার্থে মৃত্যুবরণ করাকে যাঁরা চরম সৌভাগ্য এবং কামিয়াবি মনে করতেন। হুদায়বিয়াহ সন্ধিচুক্তি সম্পাদনের পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন তাঁদের কুরবাণীর পশু যবেহ করার নির্দেশ প্রদান করলেন তখন নাবী কারীম (ﷺ)-এর নির্দেশ পালনের জন্য তাঁরা কোন সাড়াই দিলেন না। তাঁদের এ মনোভাব প্রত্যক্ষ করে নাবী কারীম (ﷺ) অত্যন্ত ব্যাকুল ও বিচলিত বোধ করতে থাকলেন। কিন্তু উম্মাহাতুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রাঃ)-এর পরামর্শ অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যখন কারো সঙ্গে কোন বাক্যালাপ না করে নিজে কুরবানীর পশু যবেহ করলেন তখন তাঁর অনুসরণে নিজ নিজ কুরবানীর পশুর যবেহ করার জন্য সাহাবীগণ (রাযি.) দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিলেন এবং নিজ নিজ পশু যবেহ করলেন। এ ঘটনা থেকেই এটা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, প্রতিষ্ঠিত কোন রেওয়াজ রসমের মূলোৎপাটন করতে হলে কথা ও কাজের প্রভাবের মধ্যে কতটুকু পার্থক্য রয়েছে। এ কারণেই জাহেলিয়াত যুগের পোষ্য পুত্র প্রথার বিলোপ সাধনের ব্যাপারটিকে শুধু কথার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে নাবী কারীম (ﷺ)-এর পালিতপুত্রের স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ বন্ধনের মতো একটি শক্তিশালী দৃষ্টান্ত অবলম্বনের জন্য আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ প্রদান করলেন।

এ বিবাহ সম্পর্কে কাজে পরিণত হওয়া মাত্রই মুনাফিক্বগণ নাবী কারীম (ﷺ)-এর বিরুদ্ধে খুব জোরেসোরে মিথ্যা ও বিদ্বেষমূলক প্রচারণা শুরু করে দিল। এ সকল মিথ্যা প্রচার ও গুজবের ফলে কিছু সংখ্যক সরল প্রাণ মুসলিম কিছুটা প্রভাবিতও হল। এ সকল অপপ্রচারে মূলসূত্র হিসেবে মুনাফিক্বগণ শরীয়তের যে রীতিটি নিয়ে তোলপাড় শুরু করে দিল তা হচ্ছে নাবী কারীম (ﷺ)-এর ৫ম বিবাহ। যেহেতু মুসলিমগণ একই সঙ্গে চারজনের বেশী স্ত্রী রাখা বৈধ জানতেন না, সেহেতু এ বিবাহের ফলে যায়নাব (রাঃ) যখন ৫ম স্ত্রী হিসেবে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) গ্রহণ করলেন তখন তারা একটি মোক্ষম সুযোগ পেয়ে গেল। তাছাড়া যেহেতু যায়দকে নাবী কারীম (ﷺ)-এর পুত্র হিসেবে গণ্য করা হতো সেহেতু তিনি যখন যায়েদের তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন তখন অপ প্রচারের জন্য তারা আরও একটি সুযোগ হাতে পেয়ে গেল। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা সূরাহ আহযাবের কয়েকটি আয়াত নাজিল করে সমস্যার সমাধান করে দেন। এতে সাহাবীগণ (রাযি.) অবহিত হন যে, ইসলামে পোষ্যপুত্র সম্পর্কের কোন ভিত্তি কিংবা মর্যাদা নেই। অধিকন্তু এর ফলে তারা এটাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, জাহেলিয়াত যুগের একটি খারাপ রেওয়াজের মূলোৎপাটন কল্পেই একটি বিশেষ নবুওয়াতী ব্যবস্থা হিসেবে আল্লাহ তা'আলাভ নাবী কারীম (ﷺ)-এর এ বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন। বিবাহের এ সংখ্যা (৫ম) শুধুমাত্র নাবী (ﷺ)-এর জন্য, অন্য কারো জন্য নয়।

উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের (রাযি.) সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর বসবাসের ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত ভদ্রোচিত, সুশোভন, স্বহৃদয়তাসম্পন্ন এবং সর্বোত্তম মর্যাদাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। পবিত্র বিবিগণও (রাযি.) ছিলেন ভদ্রতা, ধৈর্য্য সহ্য, অল্পে তুষ্টি, বিনয় সেবা, এবং ত্যাগ তিতিক্ষার মূর্ত প্রতীক, অথচ নাবী কারীম (ﷺ)-এর জীবনযাত্রা ছিল এমন এক কষ্ট সাধনের স্বেচ্ছাবলম্বিত দারিদ্র এবং অভাব অনটনের যা মেনে নেয়া কিংবা যে অবস্থার সঙ্গে

খাপ খাইয়ে চলা কোন সাধারণ মহিলাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আনাস (রাঃ) এ বলে বর্ণনা করেছেন যে, ‘মৃত্যুবরণ করা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যে কখনো ময়দার রুটি খেয়েছেন আমার জানা নেই এবং তিনি যে কখনো স্বচক্ষে বকরির ভূনা গোস্ত দেখেছেন সে কথাও আমার জানা নেই।[2]

আয়িশাহ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, দু’ মাস অতিবাহিত হয়ে গিয়ে তৃতীয় মাসের চাঁদ দেখা যেত অথচ রাসূলে কারীম (ﷺ)-এর গৃহে আগুন জ্বলত না।’ উরওয়া জিজ্ঞেস করলেন, ‘তাহলে আপনারা কী খেতেন?’ তিনি বললেন, ‘শুধু দু’টি কালো জিনিস খেজুর এবং পানি’।[3] এ বিষয় সম্পর্কিত হাদীসের সংখ্যাধিক্য রয়েছে।

উল্লেখিত অসচ্ছলতা সত্ত্বেও পবিত্র বিবিগণ কখনই কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করেননি এবং এমন কোন কথা বলেন নি কিংবা কাজ করেননি যা নাবী কারীম (ﷺ)-এর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। শুধু একবার একটি ঘটনা ঘটেছিল যার ফলে নাবী (ﷺ) কিছুটা বিব্রতবোধ করেছিলেন। কিন্তু সেটা মানব প্রকৃতির চাহিদার অনুরূপ ক্ষেত্রে তৈরি করে নিয়েছিলেন তা বলা মুস্কিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আল্লাহ তা‘আলা আয়াতে ‘তাখয়ীর’ অবতীর্ণ করেন। (অর্থাৎ দুটি জিনিসের মধ্যে একটিকে সমানভাবে অবলম্বনের অধিকার দেয়া)। আয়তটি হচ্ছে,

(أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلاً وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيْمً) [الأحزاب: 28، 29]

‘হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীদের বলে দাও- তোমরা যদি পার্থিব জীবন আর তার শোভাসৌন্দর্য কামনা কর, তাহলে এসো, তোমাদেরকে ভোগসামগ্রী দিয়ে দেই এবং উত্তম পন্থায় তোমাদেরকে বিদায় দেই। ২৯. আর তোমরা যদি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও পরকালের গৃহ কামনা কর, তবে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য আল্লাহ মহা পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।’ [আল-আহযাব (৩৩) : ২৮-২৯]

এ আয়াতে কারীমার প্রেক্ষিতে নাবী কারীম (ﷺ)-এর পবিত্র বিবিগণ সম্পর্কে সহজেই ধারণা করা যায় যে, তাঁরা কতটা উন্নত রুচিসম্পন্ন এবং পদমর্যাদা সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর তাঁরা কতটা ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁদের জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে তাঁরা পার্থিব সুখ সাচ্ছন্দ্য ও আরাম আয়েশের পরিবর্তে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এবং পরলৌকিক জীবনকেই প্রাধান্য প্রদান করেছেন।

সাধারণ ক্ষেত্রে সতীনদের মধ্যে যে হিংসা-বিদ্বেষ বাদানুবাদ, কলহ কিংবা অযাচিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে পবিত্র বিবিগণের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও অনাকাঙ্খিত সেরূপ কোন কিছু ঘটতে দেখা যায়নি। কদাচিৎ কখনো কোন ব্যাপারে তাঁদের মধ্যে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হতে দেখা গেলে আল্লাহ তা‘আলাভ যখন আয়াত অবতীর্ণ করে তাঁদের সচেতন করে তুলছেন তার পর আর কখনই সে সবের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়নি। সূরাহ তাহরীমের প্রথম পাঁচটি আয়াতে সে সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا ۖ قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5)

হে নবী! আল্লাহ যা তোমার জন্য হালাল করেছেন তা তুমি কেন হারাম করছ? (এর দ্বারা) তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি পেতে চাও, (আল্লাহ তোমার এ ত্রুটি ক্ষমা করে দিলেন কেননা) আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। ২. আল্লাহ তোমাদের জন্য নিজেদের কসমের বাধ্যবাধকতা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন, আল্লাহ তোমাদের মালিক-মনিব-রক্ষক, আর তিনি সর্বজ্ঞাতা, মহা প্রজ্ঞার অধিকারী। ৩. স্মরণ কর- যখন নবী তার স্ত্রীদের কোন একজনকে গোপনে একটি কথা বলেছিল। অতঃপর সে স্ত্রী যখন তা (অন্য একজনকে) জানিয়ে দিল, তখন আল্লাহ এ ব্যাপারটি নবীকে জানিয়ে দিলেন। তখন নবী (তার স্ত্রীর কাছে) কিছু কথার উল্লেখ করল আর কিছু কথা ছেড়ে দিল। নবী যখন তা তার স্ত্রীকে জানাল তখন সে বলল, 'আপনাকে এটা কে জানিয়ে দিল?'' নবী বলল, ''আমাকে জানিয়ে দিলেন যিনি সর্বজ্ঞাতা, ওয়াকিফহাল।'' ৪. তোমরা দু'জন যদি অনুশোচনাভরে আল্লাহর দিকে ফিরে আস (তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম), তোমাদের অন্তর (অন্যায়ের দিকে) ঝুঁকে পড়েছে, তোমরা যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সহযোগিতা কর, তবে (জেনে রেখ) আল্লাহ তার মালিক-মনিব-রক্ষক। আর এ ছাড়াও জিবরীল, নেককার মু'মিনগণ আর ফেরেশতাগণও তার সাহায্যকারী। ৫. নবী যদি তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেয় তবে সম্ভবতঃ তার প্রতিপালক তোমাদের পরিবর্তে তাকে দিবেন তোমাদের চেয়ে উত্তম স্ত্রী- যারা হবে আত্মসমর্পণকারিণী মু'মিনা অনুগতা, তাওবাহকারিণী, 'ইবাদাতকারিণী, রোযা পালনকারিণী, অকুমারী ও কুমারী। (সূরাহ তাহরীম ৬৬ : ১-৫ আয়াত)

পরিশেষে এটা বলা অসঙ্গত হবে না যে, এ প্রসঙ্গে আমরা অধিক স্ত্রী গ্রহণের বিষয়টি আলোচনা করার প্রয়োজনবোধ করি নি। কারণ, এ ব্যাপারে যারা অধিক সমালোচনা মুখর থাকে অর্থাৎ ইউরোপবাসীগণ অধিক গ্রহণ ব্যবস্থাকে নিরুৎসাহিত করে তারা যে ধরণের দুর্বিষহ জীবন যাপনকে বৈধ করে নিয়েছে, ফ্রী স্টাইলে যৌন সম্ভোগকে পরোক্ষ অনুমোদন দান করার মাধ্যমে প্রত্যেক মুহূর্তে হলাহল পান করে যেভাবে সমাজ জীবনকে বিষাক্ত ও কলুষিত করে তুলেছে তা চিন্তা করতেও বিবেক দারুণভাবে বিপন্নবোধ করে। ইউরোপবাসীগণের পশু প্রবৃত্তিজাত ঘৃণ্য জীবন যাপন অধিক গ্রহণের যৌক্তিকতার সব চাইতে বড় সাক্ষী এবং সমাজবিজ্ঞানীদের জন্য উত্তম শিক্ষা ও চিন্তার বিষয়।

ফুটনোট

[1] যাদুল মা'আদ ১ম খন্ড ২৯ পৃঃ।

[2] সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড ৯৫৬ পৃঃ।

[3] সহীহুল বুখারী ২য় খন্ড ৯৬৫ পৃঃ।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=6477

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন